জিলহজের প্রথম দশ দিন ঃ তৎপর্য ও ফজিলত

(বাংলা)

فضل عشر ذي الحجة

[باللغة العربية]

সংকলনে : আব্দুলণ্ডাহ শহীদ আব্দুর রহমান

إعداد : عبد الله شهيد عبد الر حمن

সম্পাদক: নুমান আবুল বাশার

مراجعة : نعمان ابوالبشر

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়া, রিয়াদ

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

২০০৭-১৪২৮

যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের
ফজিলত ও আমল

যিলহজ মাসের প্রথম দশকের ফজিলত

ইসলামে যতগুলো মর্যাদাবান ও ফজিলতপূর্ণ দিবস রয়েছে তার মাঝে উলেণ্টখযোগ্য হল যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন। এর মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে অনেক বাণী রয়েছে। এ সংক্রান্ড় কতিপয় আয়াত ও হাদিস নিম্নে উলেণ্টখ করা হল—

(১) আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে এ দিবসগুলোর রাত্রিসমূহের শপথ করেছেন। আমরা জানি আলণ্ডাহ তাআলা যখন কোন বিষয়ের শপথ করেন তখন তা তার গুর ্বত্ব ও মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। তিনি এরশাদ করেন—

وَالْفَجْرِ ﴿1﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿2﴾

'শপথ ফজরের ও দশ রাতের'।[১]

সাহাবি ইবনে আব্বাস রা., ইবনে যুবাইর ও মুজাহিদ রহ. সহ আরো অনেক মুফাসসিরে কেরাম বলেছেন যে, দশ রাত বলতে এ আয়াতে যিলহজ মাসের প্রথম দশ রাতের কথা বলা হয়েছে। ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন 'এ মতটিই বিশুদ্ধ।'[২]

নবী কারীম স. থেকে এ দশ রাতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন বাণী পাওয়া যায় না।

(২) রাসূলুলণ্ডাহ স. বলেছেন : যিলহজের প্রথম দশ দিন হল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দিন। এ প্রসঙ্গে বহু হাদিস এসেছে। যার কয়েকটি তুলে ধরা হল—

১.

عن ابن عباس– رضي الله عنهما– أن النبي– صلى الله عليه وسلم– قال : **ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر**، فقالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم– : **ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء**. (رواه البخاري 969 والترمذي 757 واللفظ له)

সাহাবি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুলণ্ডাহ স. বলেছেন : **যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করার মত প্রিয় আলণ্ডাহর নিকট আর কোন আমল নেই**। তারা প্রশ্ন করলেন হে আলণ্ডাহর রাসূল ! আলণ্ডাহর পথে জিহাদ করা কি তার চেয়ে প্রিয় নয় ?

রাসূলুলণ্ডাহ স. বললেন : **না, আলণ্ডাহর পথে জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তির কথা আলাদা যে তার প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে আলণ্ডাহর পথে জিহাদে বের হয়ে গেল অত:পর তার প্রাণ ও সম্পদের কিছুই ফিরে এল না।**[৩]

২.

عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما– عن النبي– صلى الله عليه وسلم– قال : **ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد**. (رواه أحمد 132 وقال أحمد شاكر :إسناده صحيح)

আব্দুলণ্ডাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত নবী কারীম স. বলেছেন : **এ দশ দিনে (নেক) আমল করার চেয়ে আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই। তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল- াল- াহ) তাকবীর (আল- াহু আকবার) তাহমীদ (আল-হামদুলিলণ্ডাহ) বেশি করে পাঠ কর।**[৪]

৩.

ما من أيام أفضل من أيام عشر ذي الحجة، قال : فقال رجل : يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهاداً في سبيل الله ؟ قال : هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله...(صحيح ابن حبان 3853 و ذكر محققه أنه حديث صحيح انظر 9164)

যিলহজের প্রথম দশ দিনের চাইতে উত্তম কোন দিন নেই। বর্ণনাকারী বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল- াহর রাসূল ! এ দশ দিন (আমলে সালেহ) উত্তম, না আলণ্ডাহর পথে জিহাদের প্রস্তুতি উত্তম ? তিনি বলেন, আলণ্ডাহর পথে জিহাদের প্রস্তুতি চেয়ে তা (আমল) উত্তম।[৫]

এ তিন হাদিসের অর্থ হল—বছরে যতগুলো পবিত্র দিন আছে তার মাঝে এ দশ দিনের প্রতিটি দিন হল সর্বোত্তম। যেমন এ দশ দিনের অন্তর্ভুক্ত কোন জুমআর দিন অন্য সময়ের জুমআর দিন থেকে উত্তম বলে বিবেচিত।

(৩) আলণ্ডাহর রাসূল স. এ দিনসমূহে নেক আমল করার জন্য তার উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। তার এ উৎসাহ এ সময়ের ফজিলত প্রমাণ করে।

(৪) নবী কারীম স. এ দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আলোচিত হয়েছে উপরে ইবনে আব্বাসের হাদিসে। আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিন বলেন—

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ . (الحج : 28)

'যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিন সমূহে আলণ্ডাহর নাম স্মরণ করতে পারে।'[৬]

এ আয়াতে নির্দিষ্ট 'দিনসমূহ' বলতে কোন দিনগুলোকে বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে ইমাম বোখারি রহ. বলেন—

قال ابن عباس: أيام العشر

'ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন : 'নির্দিষ্ট দিনসমূহ দ্বারা যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে।'[৭]

(৫) যিলহজ মাসের প্রথম দশকে রয়েছে আরাফা ও কোরবানির দিন। আর এ দুটো দিনের রয়েছে অনেক বড় মর্যাদা। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن عائشة– رضي الله عنها– قالت : إن رسول الله– صلى الله عليه وسلم– قال : ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول : ما أراد هؤلاء؟ .(رواه مسلم 1348)

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুলণ্ডাহ স. বলেন : 'আরাফার দিন আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন—'তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দাগণ আমার কাছে কি চায় ?'[৮]

আরাফাহ (যিলহজ মাসের নবম তারিখ)-এ-দিনটি ক্ষমা ও মুক্তির দিন। এ দিনে সওম পালন করলে তা দু বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হিসেবে গণ্য হয়। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن أبي قتادة– رضي الله عنه– أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم– قال : ...صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفرا السنة التي قبله والسنة التي بعده ...(رواه مسلم 1662)

সাহাবি আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুলণ্ডাহ স. বলেন : **'আরাফার দিনের সওম আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিন বিগত ও আগত বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করেন।'**[৯]

তবে আরাফার এ দিনে আরফাতের ময়দানে অবস্থানকারী হাজীগণ সওম পালন করবেন না। কোরবানির দিনের ফজিলত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে :—

عن عبد الله بن قرط– رضي الله عنه– قال: قال رسول الله– صلى الله عليه وسلم– : أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، ثم يوم القر.

(رواه أبو داود 1765 وصححه الألباني 1552)

সাহাবি আব্দুলণ্ডাহ ইবনে কুর্ত রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুলণ্ডাহ স. বলেছেন : **'আলণ্ডাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে উত্তম দিন হল কোরবানির দিন তারপর কোরবানি পরবর্তী মিনায় অবস্থানের দিনগুলো।'**[১০]

(৬) যিলহজ মাসের প্রথম দশকের এ দিনগুলো এমন মর্যাদাসম্পন্ন যে, এ দিনগুলোতে সালাত, সওম, সদকা, হজ ও কোরবানি আদায় করা হয়ে থাকে। অন্য কোন দিন এমন পাওয়া যায় না যাতে এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল একত্র হয়।

একটি জিজ্ঞাসা : রমজানের শেষ দশক অধিক ফজিলতপূর্ণ না কি যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন বেশি ফজিলতসম্পন্ন ?

যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিবস অধিক ফজিলতপূর্ণ—এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। করণ, এ বিষয়ে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ রয়েছে। তবে মতভেদের অবকাশ রয়েছে রাত্রির ফজিলত নিয়ে। অর্থাৎ, রমজানের শেষ দশকের রাত বেশি ফজিলতপূর্ণ না যিলহজের প্রথম দশকের রাতসমূহ বেশি ফজিলতের অধিকারী ?

বিশুদ্ধতম মত হল, রাত হিসেবে রমজানের শেষ দশকের রাতগুলো ফজিলতের দিক দিয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। আর দিবসের ক্ষেত্রে যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিবস অধিক মর্যাদার অধিকারী।

ইবনে রজব রহ. বলেন : যখন রাত্র উলেণ্ডখ করা হয় তখন দিবসগুলোও তার মাঝে গণ্য করা হয়। এমনিভাবে, যখন দিবস উলেণ্ডখ করা হয় তখন তার রাত্রিগুলো তার মাঝে গণ্য হয়—এটাই নিয়ম। এ ক্ষেত্রে শেষ যুগের উলামায়ে কেরাম যা বলেছেন সেটাই চূড়ান্ড় বলে বিবেচিত হতে পারে। তাহল, সামগ্রিক বিচারে যিলহজ মাসের প্রথম দশকের দিবসগুলো রমজানের শেষ দশকের দিবস সমূহের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। আর রমজানের শেষ দশকের লাইলাতুল কদর হল সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন।

ইবনুল কায়্যিম রহ. এ ক্ষেত্রে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন : রমজানের শেষ দশকের রাতগুলো সবচেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ। কারণ, তাতে লাইলাতুল কদর রয়েছে। অপরদিকে, যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের দিবসসমূহ অধিকতর ফজিলতপূর্ণ, কারণ এ দিনগুলোতে তালবীয়াহ-এর দিন, আরাফার দিন, কোরবানির দিন রয়েছে।[১১]

যিলহজ মাসের প্রথম দশকে নেক আমলের ফজিলত

عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال : **ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر**، فقالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم – : **ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء**. (رواه البخاري 969 والترمذي 757 واللفظ له)

সাহাবি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুলণ্ডাহ স. বলেছেন : **যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করার মত প্রিয় আলণ্ডাহর নিকট আর কোন আমল নেই**। তারা (সাহাবিগণ) প্রশ্ন করলেন হে আলণ্ডাহর রাসূল ! আল- াহর পথে জিহাদ করা কি তার চেয়ে প্রিয় নয় ?

রাসূলুলণ্ডাহ স. বললেন **: না, আলণ্ডাহর পথে জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তির কথা আলাদা যে তার প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে আলণ্ডাহর পথে জিহাদে বের হয়ে গেল অত:পর তার প্রাণ ও সম্পদের কিছুই ফিরে এল না।**[১২]

ইবনে রজব রহ. বলেছেন : বোখারির এই হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, নেক আমল করার মৌসুম হিসেবে যিলহজ মাসের প্রথম দশক হল সকল দিবসসমূহের চেয়ে আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে অধিক প্রিয়। যা আলণ্ডাহর কাছে অধিকতর প্রিয় তা তাঁর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন। হাদিসের কোন কোন বর্ণনায় আহাব্বু (প্রিয়) শব্দটি এসেছে আবার কোন কোন বর্ণনায় আফজালু (মর্যাদাসম্পন্ন) কথাটা এসেছে।

অতএব এ সময়ে নেক আমল করা বছরের অন্য যে কোন সময়ে নেক আমল করার চেয়ে বেশি মর্যাদা ও ফজিলতের অধিকারী হবে। তাই তো এ সময়ে হজ, কোরবানির মত গুরহ্নত্বপূর্ণ আমলসমূহ সম্পন্ন করা হয়।

যিলহজের প্রথম দশ দিনে যে সকল নেক আমল করা যেতে পারে

খাঁটি মনে তওবা করা—

তওবার অর্থ প্রত্যাবর্তন বা ফিরে যাওয়া। যে সকল কথা ও কাজ আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিন অপছন্দ করেন তা থেকে যে সকল কথা ও কাজ আলণ্ডাহ পছন্দ করেন তাঁর দিকে ফিরে যাওয়ার নাম তওবা—হোক এ সকল কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে। সাথে সাথে অতীতের এ ধরনের কাজ থেকে অনুতপ্ত হতে হবে, কাজগুলো ত্যাগ করতে হবে ও দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে ঐ ধরনের কাজ আর কোন দিন করব না। আরো সংকল্প করতে হবে যে, আলণ্ডাহ তাআলার পছন্দনীয় কাজ যেমন আদায় করব তেমনি তার নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার করব।

যখনই কোন পাপ কাজ সংঘটিত হবে তখন সাথে সাথে তা থেকে তওবা করা একজন মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। কেননা, তার জানা নেই কখন তার মৃত্যু হবে আর কতক্ষণ সে বেঁচে থাকবে। মনে রাখতে হবে, একটি পাপ বা গুনাহ অন্য আরেকটি গুনাহের দ্বার খুলে দেয়। তওবা না করলে এমনিভাবে গুনাহের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আর সময়ের মর্যাদা হিসেবে গুনাহের শাস্ড়ি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বা ফজিলতপূর্ণ সময়ে গুনাহের কাজের শাস্ড়ি বেশি হয়। প্রথমত গুনাহের শাস্ড়ি দ্বিতীয়ত ফজিলতপূর্ণ সময়ের অবমাননা ও অবমূল্যায়ন করার শাস্ড়ি।

ইমাম নবভী রহ. বলেন : 'মুসলিম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল সকল ধরনের গুনাহ থেকে তওবা করা যা সে করেছে। যদি কোন এক ধরনের গুনাহ থেকে তওবা করে তাহলেও তার তওবা সঠিক হবে। তবে অন্য গুনাহের তওবা

তার দায়িত্বে থেকে যাবে। কোরআনের বহু আয়াত, একাধিক হাদিস ও ইজমায়ে উম্মাহ তওবা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে।[১৩] আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামিন এরশাদ করেন :—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (التحريم : 8)

'হে মোমিনগণ! তোমরা আলণ্ঢাহর নিকট তওবা কর—বিশুদ্ধ তওবা ; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সে দিন আলণ্ঢাহ লজ্জা দেবেন না নবীকে এবং তার মোমিন সঙ্গীদেরকে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[১৪]

ইবনে কায়্যিম রহ. বলেন : খাঁটি তওবা (তওবা নাছুহ) হল তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম। প্রথম : সকল প্রকার গুনাহ থেকে তওবা করা। এমন যেন না হয় কয়েকটি গুনাহ থেকে তওবা করলাম, দু একটি রেখে দিলাম এ ভেবে যে এ থেকে আরো কয়েক দিন পরে তওবা করব। এমন করলেও তওবা হবে, তবে তা তওবা নাছূহ হিসেবে গৃহীত হবে না—যে তওবা করতে আলণ্ঢাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াতে কারীমায় নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় : সম্পূর্ণভাবে পাপ পরিত্যাগ করার জন্য সততার সাথে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। এমন যেন না হয় যে তওবা করলাম আর মনে মনে বললাম জানি না, আমি এ তওবার উপর অটল থাকতে পারব কি-না।

তৃতীয় : তওবা খালেছভাবে আলণ্ঢাহকে ভয় করে ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষেই করতে হবে। আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।

অবশ্যই এ তওবার সাথে আলণ্ঢাহ তাআলার কাছে অব্যাহতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা ও সকল গুনাহ বা পাপ নিজের থেকে মিটিয়ে দিতে হবে। তা হলেই কামেল তওবা বলে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।[১৫]

তওবা কবুলের শর্ত

সাধারণভাবে তওবা কবুলের জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে।

(১) তওবা একমাত্র আলণ্ঢাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে হবে। আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন নিয়তে করলে তওবা হবে না। মানুষকে দেখানোর জন্য বা শোনানোর জন্য বা অন্য কোন স্বার্থ হাসিলের স্বার্থে তওবা করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (الزمر : 2)

সুতরাং আলণ্ঢাহর এবাদত কর, তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে।[১৬]

তওবা করা যেহেতু একটি এবাদত তাই তা একমাত্র আলণ্ঢাহ তাআলার উদ্দেশ্যেই করতে হবে।

(২) যে পাপ বা গুনাহ করা হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে, আফসোস করতে হবে। কেননা হাদিসে এসেছে:—

الندم توبة (صحيح الجامع رقم 6820)

'অনুতপ্ত হওয়ার নামই তওবা।'[১৭]

তাই যে গুনাহ হয়ে গেছে তার জন্য আন্তরিকভাবে দু:খিত হতে হবে।

(৩) গুনাহ বা পাপকে পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা। যদি পাপ থেকে তওবা করে আবার সে পাপ কাজে লিপ্ত থাকা হয় তবে তা আলণ্ঢাহ তাআলার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার শামিল।

যদি পাপ কাজটি আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামিনের অধিকার (হুকুকুলণ্ঢাহ) খর্ব করা সংশিণ্ঢষ্ট হয় তবে সেটা ছেড়ে দিতে হবে। আর যদি পাপ কাজটি মানুষের অধিকার (হকুকুল এবাদ) ক্ষুণ্নকারী হয় তবে তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কোন মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা হয় তবে তা তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কারো সম্মানের হানি করা হয়—যেমন গিবত বা দোষ-চর্চা করা হল বা গালি দেয়া হল অথবা মিথ্যা অপবাদ দেয়া হল তাহলে তার

কাছে ক্ষমা চেয়ে বা অন্য কোনভাবে মিটমাট করে দাবি ছাড়িয়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করা এমন পাপ যা আল- াহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইলেও তিনি ক্ষমা করবেন না।

(৪) 'ভবিষ্যতে কখনো এ পাপে লিপ্ত হব না'—এমন দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। যদি আবার উক্ত পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে আবার তওবা করতে হবে।

(৫) তওবা করতে হবে তওবার সময়ের মাঝে। যদি তওবার সময় পার হয়ে যাওয়ার পর তওবা করা হয় তবে তা আলণ্ডাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

এখন প্রশ্ন হল তওবার সময় পার হয়ে যায় কখন ?

তওবার সময় পার হয়ে যাওয়ার দুটি অবস্থা আছে। একটি সাধারণ অবস্থা অন্যটি বিশেষ অবস্থা।

(ক) সাধারণ অবস্থা : যখন কিয়ামতের আলামত হিসেবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। তখন কোন মানুষের তওবা কবুল করা হবে না। আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا (الأنعام : 158)

'যে দিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই কিংবা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করে নাই।'[১৮]

এ আয়াতে 'প্রতিপালকের নিদর্শন'-এর ব্যাখ্যায় রাসূলে কারীম স. যা বলেছেন তা হল সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে উদিত হওয়া। অর্থাৎ যখন সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে উদিত হবে তখন কোন কাফেরের ইসলাম কবুল করা হবে না এবং পাপী ব্যক্তির তওবা গ্রহণ করা হবে না।

(খ) বিশেষ অবস্থা : যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায়। যখন কোন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তওবা করলে তা আলণ্ডাহ গ্রহণ করেন না। আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿17﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿18﴾ (النساء : 17-18)

'আলণ্ডাহ অবশ্যই সে সব লোকের তওবা কবুল করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তওবা করে, এরাইতো তারা যাদের তওবা আলণ্ডাহ কবুল করেন। তওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে 'আমি এখন তওবা করলাম' এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। এরাই তো তারা যাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।'[১৯]

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে হবে তা হল পাপ বা গুনাহ দু প্রকার। এক প্রকার যা আলণ্ডাহর অধিকার সম্পর্কিত। অন্য প্রকার যা মানুষের অধিকার সম্পর্কিত। মানুষের অধিকার ক্ষুণ্নকারী কোন পাপে যদি কেউ লিপ্ত হয় তবে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ড় ব্যক্তিকে যথাযথ পাওনা পরিশোধ করতে হবে বা তার সাথে মিটমাট করে দাবি ছাড়িয়ে নিতে হবে। অন্যথায় তওবা হবে না। যেমন কেউ অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করল। পরে সে খুব কান্নাকাটি করে অনুতপ্ত হয়ে আলণ্ডাহর কাছে তওবা করল, এতে কাজ হবে না। যার সম্পদ আত্মসাৎ করা হল তাকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে তওবা করতে হবে। এমনিভাবে কেউ কাউকে মারপিট করে বা গালি দিয়ে অথবা পরনিন্দা বা গিবত করে কিংবা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তার সম্মান ক্ষুণ্ন করল, তা হলে তাকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ড় ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে ও দাবি ছাড়িয়ে নিতে হবে। যদি তাকে পাওয়া না যায় তবে তার জন্য দোয়া করতে হবে। এ বিষয়টির গুরুত্ব দিয়ে ইমাম নবভী রহ. সহ অনেক উলামায়ে কেরাম এ বিষয়টিকে তওবার জন্য স্বতন্ত্র শর্ত হিসেবে উলেণ্ডখ করে বলেছেন : তওবার শর্ত তিনটি :—এক. অনুতপ্ত হওয়া, দুই. গুনাহ পরিত্যাগ করা, তিন. ভবিষ্যতে আর করব না বলে দৃঢ় সংকল্প করা। আর যদি গুনাহটি মানুষের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে উক্ত গুনাহ থেকে তওবা করার শর্ত চারটি। চতুর্থ শর্ত হল ক্ষতিগ্রস্ড় ব্যক্তির পাওনা আদায় করে তার কাছ থেকে দাবি ছাড়িয়ে নেয়া বা অন্য কোন উপায়ে মিটমাট করে নেয়া।

হজ ও ওমরাহ আদায় করা

হজ হল ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল স্ড়ম্ভের একটি। আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران : 97)

'মানুষের মাঝে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আলণ্ডাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক নিশ্চয়ই আলণ্ডাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।'[২০] হাদিসে এসেছে—

عن عبد الله بن عمر – رضى الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخارى 8 ومسلم 16

আব্দুলণ্ডাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে নবী কারীম স. বলেছেন : **পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। এ কথার ঘোষণা দেয়া যে আলণ্ডাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ স. আলণ্ডাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, হজ করা, রমজানে সিয়াম পালন করা।**[২১]

অতএব হজ হল সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর ফরজ। তবে ওমরাহ করার হুকুম কি? তা কি ওয়াজিব না সুন্নত ? এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হল ওমরাহ করা ওয়াজিব। যেমন হাদিসে এসেছে :—

الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان. (رواه ابن خزيمة، وإسناده قد أخرجه مسلم، لكن لم يسق لفظه، كما قال ابن حجر في الفتح 3/ 698)

'ইসলাম হল এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আলণ্ডাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই ও মোহাম্মদ স. আলণ্ডাহর রাসূল। সালাত কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে, হজ ও ওমরাহ আদায় করবে এবং জানাবাতের (সহবাস, স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত ইত্যাদির) পর গোসল করবে, পরিপূর্ণরূপে ওজু করবে ও সিয়াম পালন করবে।[২২]

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ওমরাহ পালন করা ওয়াজিব। হাদিসে আরো এসেছে—

عن عائشة– رضى الله عنها– قالت: قلت يا رسول الله : على النساء جهاد؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة. رواه ابن ماجة 2901 وصححه الألباني 2345

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুলণ্ডাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলাম মেয়েদের জন্য কি জিহাদের নির্দেশ রয়েছে ? তিনি বললেন হ্যাঁ, তাদের দায়িত্বে এমন জিহাদ রয়েছে যাতে লড়াই-যুদ্ধ নেই। তা হল হজ ও ওমরাহ।[২৩]

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মেয়েদের জন্য ওমরাহ ওয়াজিব। যখন মেয়েদের জন্য ওমরাহ ওয়াজিব হল তখন পুর"ষদের জন্য তো অবশ্যই।

হজ জীবনে একবার করা ফরজ। হাদিসে এসেছে :—

عن ابن عباس: أن الأقرع بن حابس– رضى الله عنه– سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج كل سنة أو مرة واحدة؟ قال : بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. (رواه أبو داود 1721 و صححه الألباني 1514)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত সাহাবি আকরা ইবনে হাবিছ রা. রাসূলে কারীম স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল ! হজ কি প্রতি বছর না মাত্র একবার ? তিনি বললেন **: হজ মাত্র একবার করা ফরজ। সুতরাং যে একাধিক হজ করল তা নফল হিসেবে গৃহীত।**[২৪]

নবী কারীম স. এ দুটি মর্যাদাপূর্ণ এবাদতের জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। এ দুটি এবাদতে রয়েছে পাপের কুফল থেকে আত্মার পবিত্রতা, যার মাধ্যমে মানুষ আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত হতে পারে। তাই নবী কারীম স. বলেছেন :—

من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. (رواه البخاري1449 ومسلم1350)

'যে ব্যক্তি হজ করেছে, তাতে কোন অশণ্টীল আচরণ করেনি ও কোন পাপে লিপ্ত হয়নি সে যেন সেই দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে গেল যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছে।'[২৫] হাদিসে আরো এসেছে—

عن أبي هريرة– رضى الله عنه– أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . (رواه البخاري 1683 ومسلم1349)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে নবী কারীম স. বলেছেন :—

'এক ওমরাহ থেকে অন্য ওমরাহকে তার মধ্যবর্তী পাপসমূহের কাফ্ফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর কলুষমুক্ত হজের পুরস্কার হল জান্নাত।'[২৬]

হজ মাবর"র বা কলুষমুক্ত হজ বলা হয় এমন হজকে যার আহকামসমূহ পূর্ণভাবে আদায় করা হয়েছে ও হজের সময় কোন পাপ ও অশণ্টীল কাজ করা হয়নি এবং হজের সময়টা ছিল নেক আমল, কল্যাণমূলক কাজে ভরপুর।[২৭]

একজন মুসলিমের জন্য কর্তব্য হল অতি সত্বর পবিত্র হজ আদায় করে নেয়া। কেননা রাসূলে কারীম স. বলেছেন :—

من أراد الحج فليتعجل ، فإنه قد يمرض المريض ، وتضل الضالة ، وتعرض الحاجة .. رواه ابن ماجه 2883 وأحمد 355 وصححه الألباني 2331

'যে ব্যক্তি হজ করার ইচ্ছে করল সে যেন তা তাড়াতাড়ি আদায় করে নেয়। হতে পারে তাকে কোন রোগে আক্রান্ড় করবে বা বাহন হারিয়ে যাবে অথবা কোন প্রয়োজন দেখা দেবে যা তার হজ আদায়ের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।'[২৮]

যে একবার ফরজ হজ ও ওমরাহ আদায় করেছে তার জন্য বার বার তা আদায় করা মোস্ড়াহাব। কেননা এ দুটি এবাদতে রয়েছে মহা পুরস্কার ও সওয়াব। রাসূলে কারীম স. বলেছেন :—

تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر ، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. (رواه أحمد 323 والترمذي810 والنسائي 2467 وابن ماجه2883 . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي)

'তোমরা হজ ও ওমরাহ বার বার আদায়ের চেষ্টা কর। কেননা এ দুটো এবাদত দরিদ্রতাকে দূর করে যেমন আগুন লোহা ও স্বর্ণ-র"পার মরিচা দূর করে দেয়।'[২৯]

নিয়মিত ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া

অর্থাৎ ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ সময়-মত সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। যেভাবে আদায় করেছেন প্রিয় নবী স.। সকল এবাদতসমূহ তার সুন্নত, মোস্ড়াহাব ও আদব সহকারে আদায় করা। হাদিসে এসেছে—

عن أبي هريرة– رضى الله عنه– قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى قال : من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته. (رواه البخاري 6502)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুলণ্টাহ স. বলেছেন : **আল-াহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোন অলির সঙ্গে শত্র"তা রাখে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা ফরজ এবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোন এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আমার বান্দা নফল এবাদত দ্বারাই সর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয়পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে আমার কাছে কোন কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দেই। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে তাতে কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি মোমিন বান্দার প্রাণ হরণে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে থাকে অথচ আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি।'**[৩০]

এ হাদিসে কুদসীতে অনেকগুলো বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর একটি হল, ফরজ এবাদতসমূহ আলণ্টাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আর নফল (যা ফরজ নয়) এবাদত আলণ্টাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। যদি ফরজ ও নফল এবাদতসমূহ যত্ন সহকারে যথাযথ নিয়মে আদায় করা যায় তবে আলণ্টাহ রাব্বুল আলামিনের এমন নৈকট্য অর্জন করা যাবে যা তিনি এ হাদিসে উলেণ্টখ করেছেন। আমরা তার এবাদতে কীভাবে যত্নবান হতে পারি এ সম্পর্কে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন : ফরজসমূহ যত্নের সাথে আদায় করার অর্থ হল : আলণ্টাহর নির্দেশ পালন করা, তার নির্দেশকে সম্মান করা, মর্যাদা দেয়া, নির্দেশের সামনে শ্রদ্ধায় মস্ড়ক অবনত করা, আলণ্টাহর রবুবিয়্যতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার দাসত্বকে মনে প্রাণে মেনে নেয়া। আমলগুলো এভাবে যত্ন সহকারে আদায় করতে পারলে আলণ্টাহর সেই নৈকট্য অর্জন করা যাবে যা তিনি এ হাদিসে বলেছেন।

ফরজ-ওয়াজিবসমূহ যত্ন সহকারে নিয়ম মাফিক আদায় করা এমন একটি গুণ যার প্রশংসা আলণ্টাহ তাআলা তার কালামে পাকে করেছেন। বলেছেন :—

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (المعارج : 34)

‘এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান।’[৩১]

তাই আসুন ! আমরা এ পবিত্র দিনগুলোতে আলণ্ডাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভের কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের অনুশীলন করে অধিক সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করতে চেষ্টা করি।

বেশি করে নেক আমল করা

নেক আমল সকল স্থানে ও সর্বদাই আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রিয়। তবে এই বরকতময় দিনগুলোতে নেক আমলের মর্যাদা ও সওয়াব অনেক বেশি।

যারা এ দিনগুলোতে হজ আদায়ের সুযোগ পেলেন তারা তো ভাগ্যবান—সন্দেহ নেই। আর যারা হজে যেতে পারেনি তাদের উচিত হবে এ বরকতময় দিনগুলোকে মর্যাদা দিয়ে বেশি বেশি করে সালাত আদায়, কোরআন তেলাওয়াত, জিকির-আযকার, দোয়া-প্রার্থনা, দান-সদকা, মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক গভীর করা, সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় ও অসৎ কাজের নিষেধ করাসহ প্রভৃতি ভাল কাজ সম্পাদন করা। যেমন ইতিপূর্বে হাদিসে আলোচিত হয়েছে যে বেশি বেশি করে নেক আমলের মাধ্যমে আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ মহব্বত অর্জন করা যায়। (আমার বান্দা নফল এবাদত দ্বারাই সর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে।)

আল- াহ তাআলার জিকির করা

এ দিনসমূহে অন্যান্য আমলের মাঝে জিকিরের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, যেমন হাদিসে এসেছে :—

عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. (رواه أحمد 132 وقال أحمد شاكر :إسناده صحيح)

আব্দুল- াহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম স. বলেছেন : **এ দশ দিনে (নেক) আমল করার চেয়ে আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই। তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল- াল- াহ) তাকবীর (আল- াহু আকবার) তাহমীদ (আল-হামদুলিলণ্ডাহ) বেশি করে আদায় কর।**[৩২] আল- াহ রাব্বুল আলামিন বলেন :—

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (الحج : 28)

‘যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিন সমূহে আলণ্ডাহর নাম স্মরণ করতে পারে।’[৩৩]

অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বলেছেন : এ আয়াতে নির্দিষ্ট দিন বলতে যিলহজের প্রথম দশ দিনকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ সময়ে আলণ্ডাহর বান্দাগণ বেশি বেশি করে আলণ্ডাহর প্রশংসা করেন, তার পবিত্রতা বর্ণনা করেন, তার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেন, কোরবানির পশু জবেহ করার সময় আলণ্ডাহর নাম ও তাকবীর উচ্চারণ করে থাকেন।

উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা

এ দিনগুলোতে আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিনের মহত্ত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যে তাকবীর পাঠ করা সুন্নত। এ তাকবীর প্রকাশ্যে ও উচ্চস্বরে মসজিদ, বাড়ি-ঘর, রাস্ড়া-ঘাট, বাজার সহ সর্বত্র উচ্চ আওয়াজে পাঠ করা হবে। তবে মেয়েরা নিু-স্বরে পাঠ করবে। তাকবীর হল :—

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلله الحَمْدُ

আজকে আমাদের সমাজে এ সুন্নতটি পরিত্যাজ্য হয়েছে বলে মনে করা হয়। এর আমল দেখা যায় না। তাই আমাদের উচিত হবে এ সুন্নতটির প্রচলন করা। এতে তাকবীর বলার সওয়াব অর্জন হবে ও সাথে সাথে একটি মিটে যাওয়া সুন্নত জীবিত করার সওয়াব পাওয়া যাবে। হাদিসে এসেছে :—

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : من أحياء سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا .رواه الترمذي 677 وابن ماجه 209 صححه الألباني في سنن ابن ماجة 173

রাসূলুলল্লাহ স. বলেছেন : 'আমার ইন্তেকালের পরে যে সুন্নতটির মৃত্যু হয়েছে তা যে জীবিত করবে সে ব্যক্তি এ সুন্নত আমলকারীদের সওয়াবের পরিমাণ সওয়াব পাবে এবং তাতে আমলকারীদের সওয়াবে কোন অংশ কম হবে না।'[৩৪] বোখারিতে এসেছে :—

وكان ابن عمر وأبو هريرة– رضى الله عنهما– يخرجان إلى السوق في أيام العشر ، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. صحيح البخاري ،كتاب العيدين : باب فضل العمل في أيام التشريق.

সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. ও আবু হুরাইরা রা. যিলহজ মাসের প্রথম দশকে বাজারে যেতেন ও তাকবীর পাঠ করতেন, লোকজনও তাদের অনুসরণ করে তাকবীর পাঠ করতেন।[৩৫] অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল স.-এর এই দুই প্রিয় সাহাবি লোকজনকে তাকবীর পাঠের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

মনে রাখতে হবে উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ সুন্নত। কিন্তু সকলে একই আওয়াজে জামাতের সাথে তাকবীর পাঠ করবে না। কারণ এটা বেদআত। যেমন একজন বলল : 'আল্লাহু আকবার'। সকলে বলল : 'আল্লাহু আকবার'। কেননা, রাসূলুল্লাহ স. বা সাহাবায়ে কেরাম কখনো এরূপ করেননি। তবে সকলে একই সাথে ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজে তাকবীর পাঠ করতে পারবেন। তবে কাউকে তাকবীর শেখানোর জন্য এ রূপ করা হলে তার কথা আলাদা।

সতর্ক থাকতে হবে যে, আমরা কোন সুন্নত আদায় করতে যেয়ে যেন বেদআতে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। আল্লাহর রাসূল স. ও তার সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে সুন্নত সমূহ আদায় করেছেন আমাদের তেমনই করতে হবে। এটাই হল আল্লাহর রাসূলের যথার্থ অনুসরণ। আমরা যদি সে সুন্নত আদায় করতে গিয়ে সামান্যতম ভিন্ন পদ্ধতি চালু করি তাহলে তা বেদআত বলে গণ্য হবে। হাদিসে এসেছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

রাসূলে কারীম স. বলেছেন : 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যার প্রতি আমাদের (ইসলামের) নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।'[৩৬]

সিয়াম পালন করা

হাদিসে এসেছে—

عن حفصة– رضى الله عنها– قالت : أربع لم يكن يدعهن النبي– صلى الله عليه وسلم– : صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة . رواه أحمد 6/ 287 والنسائي صحيح سنن أبي داود 2106 صحيح سنن النسائي 2236

হাফসা রা. থেকে বর্ণিত যে নবী কারীম স. কখনো চারটি আমল পরিত্যাগ করেননি। সেগুলো হল : আশুরার সওম, যিলহজের দশ দিনের সওম, প্রত্যেক মাসের তিন দিনের সওম, ও জোহরের পূর্বের দু রাকাত সালাত।[৩৭]

এ হাদিসে যিলহজের দশ দিনের সওম বলতে নবম তারিখ ও তার পূর্বের সওম বুঝানো হয়েছে। কেননা দশম দিন অর্থাৎ ঈদের দিনে তো রোজা রাখা জায়েজ নেই। ইমাম নবভী রহ. বলেন : নবম তারিখে সওম পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোস্তাহাব আমল। অপরদিকে আয়েশা রা.-এর একটি উক্তি রয়েছে যে, তিনি বলেছেন : 'আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে যিলহজের দশ দিনে সওম পালন করতে দেখিনি।'

এ উক্তি সম্পর্কে ইমাম নবভী রহ. বলেন যে আয়েশা রা. এর এ উক্তিটির ব্যাখ্যা রয়েছে। ব্যাখ্যা এই যে, রাসূলুল্লাহ স. কোন অসুবিধার কারণে সওম পালন করেননি অথবা তিনি সওম পালন করেছিলেন কিন্তু আয়েশা রা. তা দেখেননি।

আয়েশা রা.-এর বক্তব্য দ্বারা যিলহজের প্রথম নয় দিনে সওম পালন না-জায়েজ হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কারণ পূর্বে আলোচিত হাফসা রা.-এর হাদিসটি মুসবিত তথা একটি আমলকে প্রতিষ্ঠিত করে। আর আয়েশা রা.-এর বক্তব্যটি একটি আমলকে নাফি (নিষেধ) করে। হাদিসশাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী যা মুসবিত (আমল প্রমাণ করে) তা নাফির উপর প্রাধান্য লাভ করে।[৩৮] এ নিয়মানুযায়ী আমলের জন্য হাফসা রা.-এর হাদিস গ্রহণ করা হবে।

অপরদিকে রাসূলে কারীম স. এ দশ দিনে সকল প্রকার নেক আমল পালন করতে উৎসাহিত করেছেন আর সওম অবশ্যই নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। বরং নেক আমলসমূহের মাঝে সওম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন আমল। হাদিসে এসেছে—

عن أبي أمامة– رضى الله عنه– قال: قلت يا رسول الله ! مرني بأمر آخذه عنك، قال : عليك بالصوم، فإنه لا مثل له . روا النسائي والحاكم

وفي رواية للنسائي أن أبا أمامة قال : مرني بعمل، فقال : عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، صححه الألباني في صحيح النسائي برقم (2100)

সাহাবি আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম : হে রাসূলুলণ্ডাহ স. আমাকে এমন একটি আমলের নির্দেশ দিন যা শুধু আমি আপনার থেকে পাওয়ার অধিকারী হব। **আলণ্ডাহর রাসূল স. বললেন : তুমি সওম (রোজা) পালন করবে। কারণ এর কোন নজির নেই।**[৩৯]

তবে নাসায়ির আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে আবু উমামা রা. বললেন : আমাকে একটি আমল সম্পর্কে নির্দেশ দিন। তিনি বললেন : **সওম পালন কর। এর সমকক্ষ কোন আমল নেই।** তিনি আবারও বললেন : আমাকে একটি আমল সম্পর্কে নির্দেশ দিন আর রাসূল স. একই উত্তর দিলেন।

এ হাদিস দ্বারা সওম যে এক বড় মর্যাদাসম্পন্ন ও আলণ্ডাহর কাছে প্রিয় আমল তা আমরা অনুধাবন করতে পারি।

কোন কোন দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, যিলহজ মাসের সাত, আট ও নয় তারিখে সওম পালন করা সুন্নত। কিন্তু সওমের জন্য এ তিন দিনকে নির্দিষ্ট করার কোন প্রমাণ বা ভিত্তি নেই। যিলহজের ১ থেকে ৯ তারিখে যে কোন দিন বা পূর্ণ নয় দিন সওম পালন করা যেতে পারে। তবে আরাফার দিন অর্থাৎ যিলহজ মাসের নবম তারিখ সওম পালনের ব্যাপারে স্বতন্ত্র নির্দেশনা রয়েছে। হাদিসে এসেছে—

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ... صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ...رواه مسلم 1163

সাহাবি আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুলণ্ডাহ স. বলেন : **'আরাফার দিনের সওম আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিন বিগত ও আগত বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।'**[৪০]

তবে যিলহজ মাসের নবম তারিখে সওম পালন করবেন তারা যারা হজ পালনে রত নন। যারা এ দিনে হজ পালনে ব্যস্ড় তাদের সওম পালন করা জায়েজ নয়। কেননা হাদিসে এসেছে :—

روى الإمام أحمد بسنده عن عكرمة، قال: دخلت على أبي هريرة في بيته، فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات.

ইমাম আহমদ ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আবু হুরাইরা রা.-এর সাথে তার বাড়িতে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম আরাফার দিনে (যিলহজের নবম তারিখে) আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত (হজ পালনে রত) ব্যক্তির সওম পালনের বিধান কি ? তিনি বললেন : রাসূলুলণ্ডাহ স. আরাফার দিনে আরাফাতে অবস্থানকারীকে সওম পালনে নিষেধ করেছেন।[৪১]

মুসলিম শরীফের হাদিসে এসেছে : রাসূলে কারীম স. আরাফার দিনে আরাফাতে অবস্থানকালে পানাহার করেছেন। তার সাথে অবস্থানরত লোকজন তা দেখেছেন।[৪২]

কোরবানি করা

এ দিনগুলোর দশম দিন সামর্থ্যবান ব্যক্তির কোরবানি করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিন তার নবীকে কোরবানি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الكوثر : 2)

'আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর৺ন ও কোরবানি কর৺ন।'[৪৩]

এ আয়াতে ঈদের সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ও কোরবানির পশু জবেহ করতে আদেশ করা হয়েছে। তাই রাসূলুলণ্ডাহ স. সারা জীবন কোরবানির ব্যাপারে অত্যন্ড় যত্নবান ছিলেন। হাদিসে এসেছে :—

قال ابن عمر رضي الله عنه : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي. أخرجه أحمد والترمذي، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (261)

সাহাবি ইবনে উমর রা. বলেছেন : নবী কারীম স. দশ বছর মদিনাতে ছিলেন, প্রতি বছর কোরবানি করেছেন।[৪৪]

ঈদের সালাত আদায় করা

এটাও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। একটি মত হল ঈদের সালাত ওয়াজিব। এ মতটাই অধিকতর শক্তিশালী। এ সম্পর্কে বিস্ড়ারিত বিবরণ সামনে আসবে।

মুসলিম হিসেবে কর্তব্য হবে ঈদের সালাতে আগ্রহ সহকারে অংশ গ্রহণ করা, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনা, এবং ঈদের প্রচলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্ড্র-ভাবনা করা। মনে রাখতে হবে ঈদের দিনটা আলণ্ডাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সৎ-কাজ করার দিন। এ দিনটা যেন গান-বাজনা, মদ্য-পান, অশালীন বিনোদন—প্রভৃতি পাপাচারের দিনে পরিণত না করা হয়। কেননা অনেক সময় এ সকল কাজ-কর্ম নেক আমল বরবাদ হওয়ার কারণে পরিণত হয়।

আরাফাহ দিবস

আরাফাহ দিবসের ফজিলত

আরাফাহ দিবস হল এক মর্যাদাসম্পন্ন দিন। যিলহজ মাসের নবম তারিখকে আরাফাহ দিবস বলা হয়। এর ফজিলত ও বিশেষত্বের আলোচনা ইতিপূর্বে ‘যিলহজ মাসের প্রথম দশকের ফজিলত’ অধ্যায়-এ করা হয়েছে।

এ দিনটি অন্যান্য অনেক ফজিলত সম্পন্ন দিনের চেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। যে সকল কারণে এ দিবসটির এত মর্যাদা তার কয়েকটি নীচে আলোচিত হল :—

ইসলাম ধর্মের পূর্ণতা লাভ, বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আলণ্ডাহর নিয়ামতের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির দিন। হাদিসে এসেছে—

روى الإمام البخاري– رحمه الله– بسنده عن طارق بن شهاب : قالت اليهود لعمر : إنكم تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا، فقال عمر : إني لأعلم حيث أنزلت ، وأين أنزلت، وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت: يوم عرفة وإنا والله بعرفة، (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة : 3 رواه البخاري 4606

ইমাম বোখারি রহ. তার নিজ সূত্রে তারেক বিন শিহাব রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে ইহুদীরা উমর রা.-কে বলল : আপনারা এমন একটি আয়াত তেলাওয়াত করে থাকেন যদি সে আয়াতটি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হতো তাহলে আমরা সে দিনটিকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করতাম। উমর রা. এ কথা শুনে বললেন : আমি অবশ্যই জানি কখন তা অবতীর্ণ হয়েছে, কোথায় তা অবতীর্ণ হয়েছে, আর অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুলণ্ডাহ স. কোথায় ছিলেন। হা, সে দিনটি হল আরাফাহ দিবস, আলণ্ডাহর শপথ ! আমরা সে দিন আরাফাতের ময়দানে ছিলাম। আয়াতটি হল : **আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম**[৪৫]।[৪৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে রজব রহ. সহ অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে এ আয়াত নাজিলের পূর্বে মুসলিমগণ ফরজ হিসেবে হজ আদায় করেননি। তাই হজ ফরজ হিসেবে আদায় করার মাধ্যমে দ্বীনে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল।[৪৭]

এ দিন হল ঈদের দিন সমূহের একটি দিন। হাদিসে এসেছে :—

روى أبو داود عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب(صححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 2114).

আবু দাউদ সাহাবি আবু উমামাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুলণ্ডাহ স. বলেছেন : **আরাফাহ দিবস, কোরবানির দিন, ও আইয়ামে তাশরীক (কোরবানি পরবর্তী তিন দিন) আমাদের ইসলামের অনুসারীদের ঈদের দিন। আর এ দিনগুলো খাওয়া-দাওয়ার দিন।**[৪৮]

في معنى حديث عمر السابق عن ابن عباس– رضى الله عنهما– أنه قال : فإنها نزلت في عيدين اثنين : في يوم الجمعة ويوم عرفة.(صححه الألباني في سنن الترمذي برقم 2438)

ইতিপূর্বে আলোচিত উমর রা. বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রা. বলেন : সূরা মায়েদার এ আয়াতটি নাজিল হয়েছে দুটো ঈদের দিনে। তাহল জুমআর দিন ও আরাফাহ দিবস।[৪৯]

এ হাদিস দুটো দ্বারা বুঝে আসে যে আরাফাহ দিবসকে ঈদের দিনের অন্ড্র্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে।

আরাফাহ দিবসের রোজা দু বছরের কাফ্ফারা

যেমন হাদিসে এসেছে—

عن أبي قتادة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال : (يكفر السنة الماضية والباقية) . (رواه مسلم 1163)

সাহাবি আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুলণ্ঢাহ স.-কে আরাফাহ দিবসের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : '**বিগত ও আগত বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।**'[৫০]

আরাফার দিন গুনাহ মাফ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের দিন

যেমন হাদিসে এসেছে—

عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول : ما أراد هؤلاء؟

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুলণ্ঢাহ স. বলেন : '**আরাফার দিন আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন : 'তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দাগণ আমার কাছে কি চায় ?**'[৫১]

ইমাম নবভী রহ. বলেন : এ হাদিসটি আরাফাহর দিবসের ফজিলতের একটি স্পষ্ট প্রমাণ।

ইবনে আব্দুল বির বলেন : এ দিনে মোমিন বান্দারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হন। কেননা, আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামিন গুনাহগারদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন না। তবে তওবা করার মাধ্যমে ক্ষমা-প্রাপ্তির পরই তা সম্ভব। হাদিসে আরো এসেছে:—

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء ، فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاؤوني شعساً غبراً. أخرجه الإمام أحمد والحاكم واللفظ له، وقال شاكر إسناده صحيح. (المستدرك 1/ 465)

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলে কারীম স. বলেছেন : '**নিশ্চয়ই আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামিন আরাফাতে অবস্থানকারীদের নিয়ে আসমানের অধিবাসীদের কাছে গর্ব করেন। বলেন : আমার এ সকল বান্দাদের দিকে চেয়ে দেখ ! তারা এলোমেলো কেশ ও ধুলোয় ধূসরিত হয়ে আমার কাছে এসেছে।**'[৫২]

আরাফাহ দিবসে যে সকল আমল শরিয়ত দ্বারা প্রমাণিত

এ দিনে রোজা পালন করা। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن أبي قتادة– رضى الله عنه– أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ... صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ....(رواه مسلم 1163)

সাহাবি আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুলণ্ঢাহ স. বলেন : '**আরাফার দিনের সওম আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামিন বিগত ও আগত বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।**'[৫৩]

মনে রাখতে হবে আরাফার দিনে সওম তারাই রাখবেন যারা হজ পালনরত নন। যারা হজ পালনে রত তারা আরাফার দিবসে সওম পালন করবেন না। যেমন ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

আরাফার দিনে হজ পালনরত ব্যক্তি রাসূলে কারীম স.-এর আদর্শ অনুসরণ করেই ঐ দিনের সওম পরিত্যাগ করবেন। যেন তিনি আরাফাতে অবস্থানকালীন সময়ে বেশি বেশি করে জিকির, দোয়াসহ অন্যান্য আমলে তৎপর থাকতে পারেন।

আর এদিনে শরীরের সমস্ড় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে সকল হারাম ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। হাদিসে এসেছে—

في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس– رضى الله عنهما– وفيه (**إن هذا اليوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر له**) (ورواه المستدرك وقال شاكر إسناده صحيح)

মুসনাদে আহমদে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, **এ দিনে যে ব্যক্তি নিজ কান ও চোখের নিয়ন্ত্রণ করবে তাকে ক্ষমা করা হবে।**[৫৪]

মনে রাখা দরকার যে শরীরের অঙ্গ সমূহ হারাম ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে হেফাজত করা যেমন সওমের দাবি তেমনি হজেরও দাবি। কাজেই সর্বাবস্থায় এ দিনে এ বিষয়টির প্রতি যত্নবান হতে হবে। আলণ্ঢাহ ও তার রাসূলের

আদেশ
বাস্তবায়ন ও নিষেধগুলোকে পরিহার করতে হবে।

অধিক পরিমাণে জিকির ও দোয়া করা

নবী কারীম স. বলেছেন :—

خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ(. رواه الترمذي 2837 ورواه مالك في الموطأ وصححه الألباني)

'সবচেয়ে উত্তম দোয়া হল আরাফাহ দিবসের দোয়া। আর সর্বশ্রেষ্ঠ কথা যা আমি বলি ও নবীগণ বলেছেন, তাহল : আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই। তিনি একক তার কোন শরিক নেই। রাজত্ব তারই আর সকল প্রশংসা তারই প্রাপ্য, এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।'[৫৫]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্দুল বার বলেন : 'এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আরাফা দিবসের দোয়া নিশ্চিতভাবে কবুল হবে আর সর্বোত্তম জিকির হল লা-ইলাহা ইল- ল্ল- াহ।'[৫৬]

ইমাম খাত্তাবী বলেন : এ হাদিস দ্বারা বুঝে আসে যে দোয়া করার সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা ও তার মহত্ত্বের ঘোষণা দেয়া উচিত।[৫৭]

তাকবীর পাঠ করা

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে যিলহজ মাসের প্রথম দিকের আমলের মাঝে একটি আমল হল সব সময় ও সকল স্থানে তাকবীর পাঠ করা মোস্তাহাব। অবশ্য যে অবস্থায় আল্লাহর জিকির করা যায় না সে সময় ব্যতীত।

যিলহজ মাসের এ তাকবীরের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বলেন : এ তাকবীর আদায়ের পদ্ধতি সাধারণত দু প্রকার।

(এক) আত-তাকবীরুল মুতলাক : অর্থাৎ যে তাকবীর সর্বদা পাঠ করা যেতে পারে। এ তাকবীর যিলহজ মাসের শুরু থেকে ১৩ ই যিলহজ পর্যন্ত দিন রাতের যে কোন সময় আদায় করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

(দুই) আত-তাকবীরুল মুকাইয়াদ : বা বিশেষ সময়ের তাকবীর। সেটা হল ঐ তাকবীর যা সালাতের পরে আদায় করা হয়ে থাকে। আর এ তাকবীরের বিষয়ে দুটি মাসআলা রয়েছে।

(ক) তাকবীর পাঠের শুরু ও শেষ সময় :

এ দ্বিতীয় প্রকার তাকবীর যা সালাতের পরে পাঠ করা হয়ে থাকে তা কোন্ তারিখ থেকে কোন্ তারিখ পর্যন্ত পাঠ করা হবে এ প্রশ্নে উলামাদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ সকল মতভেদ উল্লেখ করার পর বলেন : 'কোন্ তারিখ থেকে কোন্ তারিখ পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা হবে এ বিষয়ে রাসূলে কারীম স. থেকে স্পষ্ট কোন হাদিস নেই।[৫৮]

এ বিষয়ে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হল যা সাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে আলী রা. ও ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে। তাহল যিলহজ মাসের নবম তারিখ থেকে মিনার শেষ দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা। মুহাদ্দিস ইবনুল মুনজির সহ অনেকে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।[৫৯]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন : 'তাকবীর পাঠের সময়সীমার ব্যাপারে এ মতটি হল সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত।'[৬০]

(খ) যে সকল সালাতের পর এ তাকবীর পাঠ করা হবে :

ইমাম বোখারি রহ. তার সহিহ আল-বোখারিতে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, তার নাম দিয়েছেন 'মিনাতে অবস্থানের দিনগুলোতে তাকবীর ও যখন আরাফাতের দিকে রওয়ানা করা হয়।' সে অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন : 'উমর রা. মিনাতে সালাতের সময় তাকবীর পাঠ করতেন। মসজিদে অবস্থানকারীগণ তা শুনে তাকবীর পাঠ করতেন। এমনিভাবে যারা বাজারে থাকতেন তারাও তাকবীর পাঠ করতেন, ফলে মিনা উপত্যকা তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে যেত। আর ইবনে উমর রা. এ দিনগুলোতে তাকবীর পাঠ করতেন। তাকবীর পাঠ করতেন সালাতের পর, বিছানায় অবস্থানকালে, বাজারে, জনসমাবেশে, রাস্তা-ঘাটে সর্বত্র।'[৬১]

মাইমুনাহ রা. কোরবানির দিন তাকবীর পাঠ করতেন। মহিলাগণও আবান ইবনে উসমান ও উমর বিন আব্দুল আজিজের পিছনে সালাত আদায় শেষে পুরুষদের সাথে আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে মসজিদে তাকবীর পাঠ করতেন।'

ইমাম বোখারির এ উদ্ধৃতির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন : 'সাহাবায়ে কেরামের এ সকল আমল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কোরবানির পূর্ব ও পরবর্তী দিনগুলোতে সালাতের পর তাকবীর পাঠ করা হবে, তেমনি সালাত ব্যতীত অন্যান্য সময়ও তাকবীর আদায় করা হবে।'[৬২]

এ সকল বিষয় বিবেচনায় তাকবীর পাঠের সময় নিয়ে উলামাদের মাঝে কয়েকটি মত পরিলক্ষিত হয়। নীচে মতগুলো তুলে ধরা হল :—

(এক) তাকবীর পাঠ করা হবে সকল ধরনের সালাতের পর।

(দুই) তাকবীর পাঠ করা হবে শুধু ফরজ সালাতের পর। নফল সালাতের পর নয়।

(তিন) তাকবীর পাঠ করবে পুরুষগণ, মহিলাগণ পাঠ করবে না।

(চার) জামাতে সালাত শেষে তাকবীর পাঠ করা হবে। একা একা সালাত আদায় করলে তাকবীর পাঠ জরুরি নয়।

(পাঁচ) কাজা সালাতে তাকবীর পাঠ দরকার নেই।

(ছয়) মুকিম ব্যক্তি তাকবীর আদায় করবে, মুসাফির নয়।

(সাত) শহরের অধিবাসীরা তাকবীর পাঠ করবে, গ্রামের অধিবাসীরা নয়।

কিন্তু ইমাম বোখারির উদ্ধৃত আমল দ্বারা বুঝা যায় সর্বাবস্থায়, সকল ধরনের সালাত শেষে, সকলস্থানে, নারী-পুরুষ, মুকিম-মুসাফির. শহরবাসী-গ্রামবাসী নির্বিশেষে সকলে তাকবীর পাঠ করবে।[৬৩]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর মত হল সকল সালাতের শেষে তাকবীর পাঠ করবে।[৬৪]

ইমাম বোখারি ও হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝে আসে যে মীনার দিনগুলোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঈদের দিনসহ সর্বদা তাকবীর আদায় করা যেতে পারে ও সালাতের পরও তাকবীর আদায় করতে হবে। মিনার দিন বলতে যিলহজ মাসের আট তারিখের জোহর থেকে ১৩ই যিলহজের আসর পর্যন্ত সময়কে বুঝায়।

তাকবীর বিষয়ে উপরোক্ত আলোচনার সারকথা : তাকবীরের দিন হল যিলহজ মাসের নবম তারিখ থেকে তেরো তারিখ পর্যন্ত। এ সময়ে সর্বদা সর্বাবস্থায় তাকবীর পাঠ করা যেতে পারে। সর্বাবস্থার এ তাকবীরকে বলা হয় আত-তাকবীরুল মুতলাক বা সাধারণ তাকবীর। এটাও সুন্নত। আর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এ দিনগুলোতে সালাতের পর আদায় করতে হবে। ফরজ সালাত শেষের এ তাকবীরকে বলা হয় আত-তাকবীরুল মুকাইয়াদ বা বিশেষ তাকবীর। আমরা দ্বিতীয়টির ব্যাপারে যত্নবান হলেও প্রথমটির ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন। তাই প্রথমটি অর্থাৎ আত-তাকবীরুল মুতলাক প্রচলনের দিকে আমাদের নজর দেয়া দরকার।

---

[১] সূরা ফজর : ১-২
[২] তাফসীরে ইবনে কাসীর
১-বোখারি -৯৬৯, তিরমিজি- ৭৫৭
[৪] -আহমদ-১৩২, হাদিসটি সহিহ
[৫] ইবনে হাব্বান : ৩৮৫৩
[৬]- সূরা হজ্ব ঃ ২৮
[৭] সহিহ আল-বোখারি, ঈদ অধ্যায়
[৮] মুসলিম-১৩৪৮
[৯] মুসলিম-১৬৬২
[১০] আবু দাউদ-১৭৬৫, হাদিসটি সহিহ
[১১] যাদুল মাআদ: ইবনুল কায়্যিম
১-বোখারি -৯৬৯, তিরমিজি- ৭৫৭
[১৩] নুজহাতুল মুত্তাকীন শরহু রিয়াজুসসালিহীন
[১৪] সূরা তাহরীম : ৮
[১৫] মাদারেজ আস-সালেকীন
[১৬] সূরা যুমার :২
[১৭] সহিহ আল-জামে, হাদিস নং- ৬৮২০
[১৮] সূরা আনআম : ১৫৮
[১৯] সূরা নিসা : ১৭-১৮
[২০] সূরা আলে ইমরান : ৯৭

[২১] বোখারি- ৮ মুসলিম -১৬
[২২] ইবনে খুযাইমা, হাদিসটি মুসলিমের শর্তে সহিহ
[২৩] ইবনে মাজা- ৩৯১০, হাটিসটি সহিহ
[২৪] আবু দাউদ-১৭২১, হাদিসটি সহিহ
[২৫] বোখারি -১৪৪৯, মুসলিম- ১৩৫০
[২৬] বোখারি, নং ১৬৮৩, মুসলিম, নং ১৩৪৯
[২৭] ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার
[২৮] ইবনে মাজা- ২৮৮৩, আহমদ-৩৫৫, হাদিসটি সহিহ
[২৯] আহমদ- ৩২৩, তিরমিজি- ৮১০, নাসায়ি-২৪৬৭, ইবনে মাজা- ২৮৮৩, হাদিসটি সহিহ
[৩০] বোখারি-৬৫০২
[৩১] সূরা মাআরিজ : ৩৪
[৩২] আহমদ-১৩২, হাদিসটি সহিহ
[৩৩] সূরা হহ : ২৮
[৩৪] তিরমিজি-৬৭৭ ও ইবনে মাজা- ২০৯, হাদিসটি সহিহ
[৩৫] বোখারি, ঈদ অধ্যায়
[৩৬] বোখারি-২৬৯৮, মুসলিম- ১৭১৮
[৩৭] আহমদ -২৮৭/৬ সহিহ সুনানে আবু দাউদ-২১০৬, সহিহ সুনানে নাসায়ি- ২২৩৬
[৩৮] যাদুল মাআদ : ইবনুল কায়্যিম
[৩৯] হাকেম ও সহি সুনানে নাসায়ী-২১০০
[৪০] মুসলিম-১১৬৩
[৪১] মুসনাদে আহমদ- ২০৪/২, হাকেম ৪৬৫/১, আহমদ শাকের হাদিসটি সহিহ বলেছেন।
[৪২] মুসলিম-১১২৩, ১১২৪
[৪৩] সূরা কাওসার : ২
[৪৪] আহমদ ও তিরমিজি, আহমদ শাকের হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন
[৪৫] সূরা মায়িদাহ : ৩ নং আয়াত
[৪৬] বোখারি, নং ৪৬০৬
[৪৭] লাতায়েফুল মাআরেফ : ইবনে রজব, পৃ-৪৮৬
[৪৮] সহিহ সুনানে আবু দাউদ- ২১১৪
[৪৯] সহিহ সুনানে তিরমিজি- ২৪৩৮
[৫০] মুসলিম-১১৬৩
[৫১] মুসলিম-১৩৪৮
[৫২] আহমদ ও হাকেম, হাদিসটি সহিহ
[৫৩] মুসলিম- ১১৬৩
[৫৪] আহমদ ও হাকেম, হাদিসটি সহিহ
[৫৫] তিরমিজি- ২৮৩৭, মুয়াত্তা মালেক , হাদিসটি সহিহ
[৫৬] আত-তামহীদ : ইবনে আবদুল বার
[৫৭] শান আদ-দুআ : ইমাম খাত্তাবী পৃ-২০৬
[৫৮] ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার, ৩য় খন্ড পৃ- ৫৩৫
[৫৯] ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার, ৩য় খন্ড পৃ- ৫৩৫
[৬০] মজমু আল-ফাতাওয়া : ইমাম ইবনে তাইমিয়া। ২৪ তম খন্ড পৃ-২২০
[৬১] বোখারি, কিতাবুল ঈদাইন
[৬২] ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার, ২য় খন্ড পৃ-২৩৬
[৬৩] ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার, ২য় খন্ড পৃ-২৩৭
[৬৪] মজমু আল-ফাতাওয়া : ইমাম ইবনে তাইমিয়া। ২৪ তম খন্ড পৃ-২২০